কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজ

শিক্ষক- ড.উত্তম কুমার মুখার্জী

বাংলা সম্মানিক পর্ব -৩

পত্র- সপ্তম মডিউল- ১

প্রসঙ্গ:- দেনাপাওনা -শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বিষয় -ষোড়শী চরিত্র :

পুরুষ চরিত্র অপেক্ষা নারীর চরিত্র অংকনে শরৎচন্দ্র দক্ষতা দেখিয়েছেন বেশি। তাঁর কথাসাহিত্যে উল্লেখযোগ্য নারী চরিত্রের সংখ্যা পুরুষ চরিত্রকে নিঃসন্দেহে ছাড়িয়ে গেছে। বঞ্চিতের প্রতি তাঁর সমবেদনা ও সহানুভূতির কথা শরৎচন্দ্র অনেকবার বলেছেন। এদেশের সামাজিক কাঠামোয় নারীরাই সবচেয়ে বেশি বঞ্চিত ,তাই তাদের চরিত্র শরৎচন্দ্র যে মমতা ও সমবেদনা নিয়ে আঁকবেন তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। সতীত্ব ধর্মের মাপকাঠিতে তিনি নারী চরিত্রকে বিচার করেননি। এমনকি মনুসংহিতার অনুশাসনও তাঁর কাছে কোন গুরুত্ব পায়নি ।তিনি পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের মাপকাঠিতে তাঁর সৃষ্ট নারী চরিত্রগুলিকে বিচার করেছেন।' সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন "পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব সতীত্বের চেয়ে বড় ,এই কথাটা একদিন আমি বলেছিলাম কথাটাকে যৎপরোনাস্তি নোংরা করে তুলে আমার বিরুদ্ধে গালিগালাজের আর সীমা রইল না।" নারী চরিত্র আঁকতে গিয়ে কেন বারবার তাঁকে এ কথা বলতে হয়েছে তাও বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে । তাঁর মতে মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশের ক্ষেত্রে সমাজই সবচেয়ে বড় বাধা ।মানব জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও সমাজের অন্যায় শাসন যে একেবারে দেখা যায় না তা নয়, তবে প্রেমের ক্ষেত্রেই বোধহয় সমাজ সবচেয়ে নির্দয়। প্রেম মানব হৃদয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ অনুভূতি, তাই তা জাতি ,বর্ণ ,ধর্ম বা সমস্ত কুসংস্কারে ঊর্ধ্বে। এই কারণেই প্রেমই রক্ষণশীল সমাজ এবং সমাজপতিদের শ্রেষ্ঠত্বের অহমিকায় চূড়ান্ত আঘাত আনে।

শরৎচন্দ্রের উল্লেখযোগ্য নারী চরিত্রের মধ্যে 'দেনাপাওনা'র ষোড়শী অন্যতম। সে নিঃসন্দেহে রাজলক্ষ্মী, কিরণময়ী ,সাবিত্রী, অচলা বা অভয়ার দলে। তাদের সকলেরই মত ষোড়শীরও সমস্যা প্রেমের। অন্যান্য নারী চরিত্রের সঙ্গে ষড়শীর পার্থক্য আছে। বিবাহিতা কিরণময়ী বা অচলার চরিত্রে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছিল পর পুরুষের প্রতি আকর্ষণের ফলে। কিন্তু ষোড়শির ক্ষেত্রে তা ঘটেনি। তার সমস্যা অভিনব। যে হৃদয়হীন স্বামী বিবাহ রাতেই তাকে ত্যাগ করে চলে গিয়েছিল তার কাছে সে ফিরে যাবে কিনা এই অন্তর্দ্বন্দ্বেই ষোড়শী বিপর্যস্ত। সমাজ অথবা অভিভাবকের সঙ্গে তার দ্বন্দ্ব নয়, তার দ্বন্দ্ব, নিজের সঙ্গে নিজের।

চন্ডিগড়ের দেবী মন্দিরের ভৈরবী পদে নিযুক্ত হবার আগে তার নাম ছিল অলকা । মাত্র ১০০ টাকার লোভে লম্পট জীবানন্দ একদিন তাকে বিয়ে করেছিল ,আর বিবাহ রাতেই সে তাকে ফেলে পালায়। ইতিমধ্যে অলকা পুরোপুরি ভাবে দেবী মন্দিরের ভৈরবীতে রূপান্তরিত হয়েছে। ভৈরবী জীবনের সংযম রুক্ষতার অন্তরালে তার নারী সত্তা ধীরে ধীরে চাপা পড়ে গেছে।

সংসারী মানুষের মনে লোভ থাকে আসক্তি থাকে কিন্তু দীর্ঘকালের সন্ন্যাসিনীর জীবন ষোড়শীকে করে তুলেছিল নিরাসক্ত ও নির্লোভ। সংসারী মানুষের মানসিকতা তার আয়ত্ত ছিল না। ধারণা ছিল মন্দিরের ভৈরবীর স্বামী স্পর্শ করা নিষেধ। এই কারণেই দেবী মন্দির ছেড়ে সে প্রথমে জীবানন্দের কাছে সরাসরি চলে আসেনি। বরং মন্দির এবং জীবানন্দ উভয়কেই ছেড়ে ফকির সাহেবের কুষ্ঠাশ্রমে সেবিকার দায়িত্ব নিয়ে চলে গেছে। ষোড়শির এই সিদ্ধান্ত প্রমাণ করে যে নির্মল হইমের দাম্পত্য জীবন কিন্তু তাকে তেমন প্রভাবিত করতে পারেনি। সমালোচক ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্গত কারণেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন–"ষোড়শীর মত প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বলিষ্ঠ চরিত্রের রমণীর অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা কম।"

জীবানন্দকে পাওয়ার পরও তার সংসার নিরাসক্ত ,সর্বত্যাগিনী, সন্ন্যাসিনী সত্তাটি যেন তাকে নিয়ন্ত্রিত করে চলেছে। তাই সে পুরুষানুক্রমে প্রজাদের ঋণ শোধ করার কথাই ভাবে, নিজের এতদিনকার উপবাসি হৃদয়ের দিকে ফিরে তাকানোর কথা ভাবে না। তার এই পরিণতি কিন্তু মোটেই আকস্মিক নয় তা চরিত্রটির জীবনের ধারাবাহিকতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এক কথায় শরৎ সাহিত্যে অলকা বা ষোড়শী এক অসাধারণ চরিত্র।

কিন্তু জমিদারি পরিদর্শন উপলক্ষে জীবনানন্দ চৌধুরী বীজগাঁয়ে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই ষোড়শীর জীবনে সংঘাতের সূচনা। অসুস্থ জীবানন্দের শয্যা পার্শ্বেই তার সুপ্ত নারীত্বের প্রথম জাগরণ। জীবানন্দের মুখে 'অলকা' সম্বোধন তার চিত্রকে বিচলিত করেছে সবচেয়ে বেশি। হৃদয়ের যে স্বাভাবিক দাবিকে সেই এতদিন উপেক্ষা করেছে তার শক্তি যে কত প্রবল এতদিনে ষোড়শী তা উপলব্ধি করে। এক কথায় বলা যায় ভৈরবী জীবনের ফাঁকি তার কাছে ধরা পড়ে যায়। অন্যদিকে নির্মল –হৈমের দাম্পত্য জীবনের সুখ ও মাধুর্য তাকে সংসার ধর্ম পালনের প্রলোভন যোগায়। জীবানন্দের কাছে ষোড়শী স্বীকার করেছে যে হৈম নির্মলকে দেখেই সে ভৈরবী জীবনের অসারতা অনুভব করেছিল। তাই ভৈরবী জীবন ছেড়ে দিয়ে সে অন্য কোন্ জীবন ধারণ করতে আগ্রহী তার কোন সুস্পষ্ট ইঙ্গিত এখানে নেই। সেক্ষেত্রে জীবানন্দের মনোভাব ছিল অনেক স্পষ্ট 'এখানে আমি বাঁচতে চাই, মানুষের মাঝখানে মানুষের মত বাঁচতে চাই, বাড়ি চাই ,ঘর চাই, স্ত্রী চাই, ছেলেপুলে চাই ,আর মরণ যেদিন আটকাতে পারব না সেদিন তাদের চোখের উপর দিয়েই চলে যেতে চাই।" ষোড়শির মনের কথা এটাই কিন্তু মুখ ফুটে তা প্রকাশ করার মতো মানসিক শক্তি তার ছিল না।

প্রকৃতপক্ষে সমগ্র উপন্যাসটির দিকে তাকালে ষড়শি চরিত্রের তিনটি সত্তাই চোখে পড়ে। একটি তার ভৈরবী সত্তা ,দ্বিতীয়টি অলকাসত্তা এবং তৃতীয়টি তার আদর্শনিষ্ঠ পরোপকারী সত্তা। প্রথম দুটি সত্তা উপন্যাসে প্রাধান্য পেয়েছে কিন্তু তৃতীয় সত্তাটিকে ষোড়শী একেবারে অস্বীকার করতে পারেনি।

অন্যভাবে বলা যায় তার জীবনের শেষ পর্বটিকে এই সত্তাটি প্রভাবিত করেছিল বেশি। ভৈরবীর জীবন ছেড়ে অলকার জীবনে প্রবেশ করার জন্য সে একদিকে যেমন আগ্রহী অপরদিকে তেমনি দেবী মন্দিরের মর্যাদা ও সম্পত্তি রক্ষার নৈতিক দায়িত্ব সে গ্রহণ করেছিল।। জমিদার বা জনার্দন রায়ের সঙ্গে তার প্রাথমিক সংঘাতের কারণ ও এই আদর্শনিষ্ঠা। ষোড়শী জীবন বীমুখ সন্ন্যাসিনী নয় বাস্তব জগত ও জীবনের প্রতি তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল তাই প্রবনের অত্যাচারে বিপর্যস্ত দরিদ্রের পাশে সে যেমন এসে দাঁড়িয়েছে তেমনি তার বাল্যকালের অতি পরিচিত হৈমবতীর পিতা কে বাঁচাতেও সে দ্বিধা করেনি।

জীবানন্দকে পাওয়ার পরও তার সংসার নিরাসক্ত ,সর্বত্যাগিনী, সন্ন্যাসিনী সত্তাটি যেন তাকে নিয়ন্ত্রিত করে চলেছে। তাই সে পুরুষানুক্রমে প্রজাদের ঋণ শোধ করার কথাই ভাবে, নিজের এতদিনকার উপবাসি হৃদয়ের দিকে ফিরে তাকানোর কথা ভাবে না। তার এই পরিণতি কিন্তু মোটেই আকস্মিক নয় তা চরিত্রটির জীবনের ধারাবাহিকতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এক কথায় শরৎ সাহিত্যে অলকা বা ষোড়শী এক অসাধারণ চরিত্র।

সহায়ক গ্রন্থ :-

- বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা -শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
- শরৎচন্দ্র - সুবোধ চন্দ্র সেন গুপ্ত
- শরৎচন্দ্র: পুনর্বিচার - করুন কুমার মুখোপাধ্যায়
- বাংলা উপন্যাসের কালান্তর - সরোজ বন্দোপাধ্যায়